ভূমিকা

বাংলা ছোটগল্প হল উনিশ শতকের 'Peculiar Product'। উনিশ শতকের যুগমানস অন্তরের তাগিদে এবং বাইরের প্রয়োজনে যে ভাবসত্যকে জন্ম দিয়েছিল, কার্যকারণ সূত্রে সংবাদপত্রের মধ্য দিয়েই তার কায়ারূপ নির্মিত হয়ে থাকে। অবশ্য এক্ষেত্রে 'প্রতীতীর সমগ্রতা' — 'Unity of Impression' লেখক সত্তার সম্প্রসারিত অভিব্যক্তি। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে যখন বাংলায় ছোটগল্প জন্ম নিচ্ছে, সেই সময়কালীন পরিসরে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ছিল অন্তরঙ্গ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় ছোটগল্পের প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এর প্রধান প্রাণকেন্দ্র আমেরিকা। অপ্রধান কেন্দ্র হল ফ্রান্স, রাশিয়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলা সাহিত্যের জগতে ছোটগল্প গভীরতার বৈচিত্র্যে মহিমান্বিত স্থান অর্জন করেছিল। আমেরিকায় ওয়াশিংটন আর্ভিং (১৭৮৪-১৮৫৯), অগাস্টাস বি. লংস্ট্রিট (১৭৯০-১৮৬৪), ন্যাথানিয়েল হথর্ণ (১৮০৪-১৮১৮)-এঁরা ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লেখক, যাঁদের হাতে ছোটগল্পের অভিনব রূপটির নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল তা পরিণতি পেয়েছিল এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯)-র হাতে।

এপ্রসঙ্গে বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সে এবং রাশিয়ায় দুই শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল — মোপাসাঁ (১৮৫০-৯৩) এবং চেখব (১৮৬০-১৯০৪)। দু'জনেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমকালীন। ১৮৭২ সালে চৈত্র মাসে 'ইন্দিরা' প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সম্পাদকেরা বলেছেন — ''ইন্দিরা বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনা পরীক্ষার প্রথম ফল।''[১] ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮০, জ্যৈষ্ঠ) 'বঙ্গদর্শনে' পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মধুমতী' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। ১২৮১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'ভ্রমর' পত্রিকায় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'দামিনী' ও 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' নামে দুই খানি গল্প লিখলেন। এর তিন বছর পর ১২৮৪ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ভিখারিণী' গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৯১ বঙ্গাব্দের 'নবজীবন' পত্রিকায় কার্তিক মাসে 'ঘাটের কথা' এবং অগ্রহায়ণ মাসে 'রাজপথের কথা' প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখ্য দুটি গল্পেই ছোটগল্পের লক্ষণ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে ফুটে উঠেছে। এরপর ১২৯৮-এ 'হিতবাদী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গদ্যশিল্প সৃজন খুবই পরিণত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প — দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, 'খাতা' ইত্যাদি; যেখানে বঙ্কিমী গদ্যের রূপকাঠামোগত বিন্যাস থেকে স্বতন্ত্র গদ্য ছন্দের নির্মাণ করেছেন। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের জগতে ছোটগল্প হয়ে উঠল কবিতার মতোই 'ঐক্যভাবাশ্রয়ী অথচ কল্পনা মুখ্য নয়, জীবন-নির্ভর।'[২] আমেরিকায় ছোটগল্পও এমনি যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল। সেখানে রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক কোনো বিপুল সংঘাত ছিল না ঠিকই কিন্তু লেখকের ব্যক্তিক বেদনা, ও অন্তর্লীন ট্র্যাজিডির ছাপ এখানে সুস্পষ্ট। কালগত অভিজ্ঞানের দিক থেকে উনিশ শতকীয় ছোটগল্পের কাল প্রধানত বাস্তবতাবাদ ও প্রকৃতিবাদের যুগ্ম তরঙ্গের বাঙ্ময় রূপ। একপ্রকার জিজ্ঞাসার ভিন্নস্বরেই ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি ধাবিত হয় একবিংশ শতাব্দীর সময়ের জটিল প্রেক্ষিত। চিন্তা-চেতনার আবর্তন-বিবর্তন ঘটতে থাকে পাশ্চাত্য নবজাগরণের সংস্পর্শে। একদিকে রাবীন্দ্রিক দর্শনের ঐতিহ্য পাঠকের শৈল্পিক মননে দাগ কাটে, অন্যদিকে পাশ্চাত্য ঐতিহ্য বিরোধী জীবনবোধ তথা প্রকৃতিবাদী চিন্তনের ধ্যানধারণা প্রবল ধাক্কায় প্রাচীন মূল্যবোধকে নাড়িয়ে দেয়। বাংলার

জাতীয় জীবন এবং বিকাশ ধারার ইতিহাসে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং ইউরোপীয় সভ্যতার দু'টি পরস্পর ধারার স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। উনিশ শতকে অনুসন্ধিৎসু বাঙালি সমাজ সার্থক চেষ্টা করেছিলেন দুই সভ্যতার মিলনের। এই মিলনের প্রক্রিয়ায় বৈদেশিক ভাবধারার আঘাতে জীবনের সমগ্র পরিসরের এক অভিনব সংঘাতে প্রাচীন মূল্যবোধে নির্মিত জীবনাদর্শ ভেঙে পড়ে। তারই মর্মভেদ করে অঙ্কুরিত হয়েছে নতুন চিন্তন, প্রত্যয় এবং জীবনাদর্শের সৌধ। ইংরেজী শিক্ষা আঘাত হেনেছে বাঙালীর ভাবজীবন এবং চিন্তা জীবনের মূল শিকড়ে। ফলে যুক্তিহীন ঐতিহ্যাশ্রয়ী আচারের সঙ্গে নবজাগ্রত যুক্তিবোধের দ্বন্দ্বে বাঙালী সমাজ আলোড়িত হয়ে উঠল নবচেতনাময় জিজ্ঞাসার আত্মিক অন্বেষণে। ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভিককালে নানা দিক থেকে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ হতে লাগল। এমনকি, হিন্দু ধর্মের নানা ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন খ্রীষ্টান মিশনারীরা। আহ্বান জানাতে লাগল খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য। এদিক থেকে রামমোহন রায় এবং তাঁর অনুবর্তীরা প্রচলিত হিন্দুধর্মকে বর্জনের পরিবর্তে সংস্কার করতে চাইলেন। 'ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী' নব অঙ্কুরিত জ্ঞানের আলোড়নে যুক্তির পথ ধরে হিন্দু ধর্মকে অগ্রাহ্য করতে প্রয়াসী। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। 'ইয়ং-বেঙ্গল গোষ্ঠী' রাজা রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের 'হাফ লিবারেল' বলে আক্রমণ করলেন। ডিরোজিও শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যমণি 'নাস্তিকাগ্রগণ্য' দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বর্ধমানের বিধবা মহারাণী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করে 'বিধবা বিবাহ', 'অসবর্ণ বিবাহ' ও 'রেজিস্ট্রী বিবাহ' একসঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রেতচর্চায় নিবিষ্ট ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর বিবাহ করবার জন্য খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন কিন্তু তবুও হিন্দু জাত্যাভিমান ত্যাগ করতে পারেননি। তিনি নিজেকে বলতেন ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান। যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ) বিশ্বাস করতেন 'পজিটিভিজম'-ই (Positivism) হবে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। ধর্মজিজ্ঞাসা থেকে সমাজ জিজ্ঞাসার তাগিদে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে লাগল। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ভাবধারার অভিঘাত স্বকীয় সত্তার নবনির্মিতিকে বাঙালী সমাজ পেল নতুন দৃষ্টি। যে সমাজ দৈব নির্ভর নয়, মানবতা নির্ভর। সমাজ সংস্কারকদের অনেকেই এই সময় নারীকল্যাণ, সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ আইন এবং কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, স্ত্রী শিক্ষার প্রয়াসে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এক্ষেত্রে সহজতম পথ ছিল সরকারি আইন প্রণয়ন। খ্রীষ্টান মিশনারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরকারী আইন প্রণয়নের পক্ষপাতী ছিলেন। বাঙালী সমাজ যেন এই পর্বে আত্মরক্ষা এবং আত্ম-আবিষ্কারের মননভূমি কর্ষণ করতে উৎসাহী। এই উনিশ শতকীয় কাল পরিসরে বাঙালি সমাজ তিনটি বড় শিক্ষা পেয়েছিলেন — ১। ধর্ম-জিজ্ঞাসা — মনসা-শীতলা ও জাত পাতের উপধর্মকে তারা প্রকৃত অর্থে ধর্ম বলতে অস্বীকার করেছে। ২। সমাজ জিজ্ঞাসা জরা গতিশক্তিহীন মধ্যযুগীয় সমাজের পরিবর্তে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজকে সুশিক্ষার একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ৩। সভ্যতা-জিজ্ঞাসা — উইলিয়ম জোন্স-এর সময় থেকেই সংস্কৃত চর্চার যে নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল সে ধারার মূলকথা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার। এই তিনটি জিজ্ঞাসা থেকে ধর্মের ক্ষেত্রে স্বীকৃত ধারণা হল — স্মৃতিশাস্ত্র বা তন্ত্রশাস্ত্র নয়, ভাগবত গীতা এবং উপনিষদই হল তখন থেকে নিষ্কাম কর্ম, সর্বভূতে প্রীতি এবং লোক সেবাই হিন্দুধর্মের মূল শিক্ষা রূপে স্বীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কীর্তিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে গড়া শিল্প-কৃতি বলা চলে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ছোটগল্পের স্রোত বহমান স্বতন্ত্র ধারায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক

থেকে চিন্তার বাঁকবদল হল। চিন্তাজগতে আধুনিকতার সঙ্গে এল প্রশ্নমনস্কতা। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ছোট ছোট চূর্ণকগুলিকে ছাপিয়ে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কলমে। ১৯১৪-২৮ সাল পর্যন্ত 'সবুজপত্র'-এর কাল; এটি ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৩ সালে বাংলা ছোটগল্পের জগতে নতুনতর পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যার নাম 'কল্লোল'। 'কল্লোল'-এর আবির্ভাব হয়েছিল নতুন চিন্তনের পালাবদল নিয়ে। 'কল্লোল'-এর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে ছিল 'সংহতি', 'ধূপছায়া', 'কালি-কলম', 'বিজলী', 'উত্তরা', 'বিচিত্রা', 'প্রগতি', 'প্রবাসী' এবং 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকাও বটে। ১৯২২-২৫ সাল পর্যন্ত জগদীশগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত-এর গল্পগুলি এ সকল পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। তবে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকরা কেবল 'কল্লোল' (১৯২৩), মাসিকপত্রে নয়, 'কালিকলম' (১৯২৬), 'প্রগতি' (১৯২৭) পত্রে লিখেছেন। 'কল্লোল' গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে তরুণ লেখকেরা 'রবীন্দ্র-উত্তর' যুগ আনতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু নিজেই বলেছিলেন যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ। আর সেই বিদ্রোহের কেন্দ্র বিন্দু রবীন্দ্র নাথ। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পটভূমিটির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হল রুশ বিপ্লব (১৯১৭), মানবেন্দ্র রায়ের সাম্যবাদী আন্দোলন (১৯১৯-২১) অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩১), বাংলায় কার্ল মার্কস -এর দর্শন ও লেলিন-এর রণকৌশল চর্চা (১৯৩১-৩৫) ফ্রয়ডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের ইংরেজী অনুবাদের প্রচার (১৯১৩-১৪), তাঁর শিষ্য অ্যাডলার, য়ুং এবং হ্যাভলক এলিসের প্রেমের দেহবাদী, যৌনবাদী ব্যাখ্যা, বানার্ড শ. ও ফেবিয়ানদের নব অর্থনৈতিক চিন্তা বুদ্ধিজীবীদের ভাবিয়েছিল। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪) প্রমূখ। এছাড়া ছিলেন মণীশ ঘটক (১৯০১-১৯৮০), জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৬৭)। ১৯৩০ সালে ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' এসে কল্লোলের গতি স্তিমিত করে দেয়। বাংলা ছোটগল্পে প্রকট হয়ে ওঠে সামাজিক পরিসরে স্থাপিত ব্যক্তির আত্মিক সংকটের গল্প। বিশেষত, ব্যক্তি মনের সঙ্গে সমাজের সংঘাতের যন্ত্রণা থেকেই আধুনিক অর্থে ছোটগল্পের আবির্ভাব। কিন্তু কল্লোল যুগের পর থেকে বাংলা ছোটগল্পে প্রকৃতিগত বাঁক পরিবর্তন ঘটে যায়। এই সময় যে সমস্ত লেখকেরা উঠে এসেছেন তাঁরা হলেন — কাজী নজরুল ইসলাম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলবালা ঘোষজায়া। ১৯২৮-১৯২৯ -এ আবির্ভূত হয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'রসকলি' (কল্লোল, ১৩৩৪ ফাল্গুন), তিন মাস পর প্রকাশিত হয় 'হারানো সুর' (কল্লোল, ১৩৩৫, বৈশাখ) শ্রাবণ 'স্থলপদ্ম' কল্লোল (১৩৩৫, শ্রাবণ) মাসিক পত্রে গল্প দু'টি প্রকাশিত হয়েছে বটে কিন্তু এর সুরের সঙ্গে কল্লোলের সুরের কোনো মিল নেই। 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রথম তিনটি গল্প প্রকাশের পর তারাশঙ্কর লিখতে শুরু করেছেন উপাসনা, উত্তরা, বঙ্গশ্রী, নবশক্তি, ভারতবর্ষ, প্রভৃতি মাসিক পত্রে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন গ্রামীণ, আস্তিক এবং মানবধর্মে বিশ্বাসী। তাঁর জীবনবোধের মূলে ছিল মানুষ, প্রকৃতি এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ক্রিয়াশীলতা বেশী। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় লোকজীবনের আদিমতা, পশু ও মানুষের জৈবসত্তার তাগিদের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছেন প্রকৃত জীবনসত্যের সন্ধানে। অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্য

এষণা, বস্তু জিজ্ঞাসা, বিজ্ঞান বুদ্ধি তাঁর গল্পবৃত্ত নির্মাণে সাহায্য করেছিল। 'কল্লোল' বা 'কালিকলম'-এ তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়নি। পৌষ ১৩৩৫-এ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তাঁর প্রথম লেখা 'অতসীমামী' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। নির্মোহ-নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রতি আস্থা ছিল তার লেখনি শক্তির মূলে। ১২ মে ১৯৪৫ -এ 'বেতার কথিকা', 'গল্প লেখার গল্প' ও 'লেখকের কথা' (১৯৫৭)-য় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের জীবন বোধটিকে তুলে ধরেছেন। ফ্রয়ডীয় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, মার্কসীয় ভাবধারা তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে অনবদ্য ঢঙে। বিশ শতকের তিনের দশকে বাংলা ছোটগল্পের জগতে এসে আবির্ভূত হলেন গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তিনি নিরাসক্ত জীবনশিল্পী। নিজের অভিজ্ঞতা নির্ভর জীবন-জিজ্ঞাসাকে তিনি বাণীরূপ দিয়েছেন গল্পের অবয়বে। ১৯৩০ সালের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদী চিন্তনের সূত্রপাত হয়েছিল 'কল্লোল', 'কালি কলম', 'প্রগতি' পত্রিকার মধ্য দিয়ে। এই পত্রিকাগুলির মুখ্য বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ। বিষয় প্রকরণের দিক থেকে এই দিকটি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে বাঁক পরিবর্তনের মূল আধার। তিনি রবীন্দ্রদর্শনের ভাবনাগত কাঠামোকে সৃজন করেছেন ঠিকই কিন্তু নব্যরীতির সময়চেতনার আধুনিক স্পর্শকেও পরিত্যাগ করেন নি। যা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' সময়পর্বের কাল পরিসর থেকে। এই পত্রিকারই সম্পাদক বিমল কর জানিয়েছেন — ''জ্যোতিদার লেখার সঙ্গে আমাদের লেখার যে কোথায় তফাৎ সেটা না বোঝার কারণ ছিল না। নিজে তখন অল্পস্বল্প লিখতে শুরু করেছি; সুবোধ ঘোষ ওই সময়ে আমাকে যতটা টানেন ততটা অন্য কেউ নন। কিন্তু দেখতে দেখতে জ্যোতিদার লেখার ভঙ্গি, ভাষা আমাকে টানতে লাগল। তার প্রভাবও আমি বুঝতে পারতাম।''[৩] বাস্তবিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন 'ঘড়ির মানুষ'। তার সময়চেতনা জ্ঞান স্ববালচেতনার একটি অঙ্গ, যা তাঁর শিল্পপ্রকরণগুলিকে গতানুগতিক জীবনের বৃত্ত থেকে পৃথক করেছে। স্মৃতি এবং সত্তায় বিজড়িত অন্তর্মুখী জীবনবোধের চালিকাশক্তি কঠিন নিরাসক্তির গতিরাগ। ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের অনুভূতিকে আমরা জানতে পারি তাঁর নিজস্ব জীবনদৃষ্টির লেন্সে। প্রসঙ্গত, এই সময়ের বিরাট পরিসরে থিয়েটার অব অ্যাবসার্ড, থার্ড থিয়েটারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচেষ্টাগত প্রবণতা বুদ্ধিজীবীদের ভাবিয়েছিল। বাংলা নাট্য সাহিত্যের জগতে নাট্যকার বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৩) নাটকটিও 'বাস্তব বিরোধী' এক অন্তর্জগতের প্রক্ষেপটিই চিত্রিত হয়ে ওঠে। জীবনের অস্তিত্ব সর্বস্ব সময়গ্রন্থনার প্রতিফলন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলির প্রাণবীজ নির্মিতিতে সাহায্য করেছে। চলমান জীবনের যৌনমায়া থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতার প্রাপ্তি, মন্বন্তর (১৯৪৩), উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক হানাহানি (১৯৪৮), পঞ্চাশের দশকের শেষে ক্যালিফোর্নিয়ায় তরুণ কবিদের 'বীটনিক' আন্দোলন পৌঁছেছিল ব্রিটেন; ষাটের দশকের শুরুতে অ্যালান গিনসবার্গ এলেন কলকাতায়। শুধু তাই নয়, এই সময়ই হাইডেগার-সার্ত্রের, ক্যামু দর্শন নির্ভর তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা পরিচিত হলাম। সত্তরের দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদী মননের প্রকাশ লক্ষণীয় এই সময়ই জাঁকলাকার বিচ্ছিন্নতার দর্শন, মিশেল ফুকো জনসমাজে আলোড়ন তুলেছিল। জাঁ পল সাত্রের দর্শন, আলব্যের কামুর অ্যাবসার্ড নির্ভর চিন্তন বুদ্ধিজীবীদের ভাবনা-চেতনার জগতের গতি-প্রকৃতি পালটে দিয়েছিল। ফলে যুক্তিবাদী সুস্থ চিন্তার পরিবর্তে আদিমতার নীতি-আদর্শহীনতা লক্ষণীয়। এই বিক্ষুব্ধ সময়ের আবর্তে বাংলা ছোটগল্পের সুরকার হিসেবে গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শিল্পভাবনা, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জীবনবোধ, মানব প্রকৃতিকে দেখবার সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক চোখ গল্পগুলির প্রতিটি কাহিনীবৃত্তে নির্মাণ করেছে এক ভিন্ন স্বরের কোলাজ। তাঁর 'গিরগিটি', 'সমুদ্র', 'বধিরা', 'আপেল', 'গন্ধ', 'খেলোয়াড়'

গল্পগুলি যেন নজর কেড়েছে আধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে। ইন্দ্রিয় সংবেদ্য গোপন অনুভূতির সঙ্গে মিশেছে সৌন্দর্যসত্তার সংরূপ, যৌনতার ক্লাসিক নির্মিতি। বস্তুত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজের লেখনী শক্তির বলে বাংলা সাহিত্যে নিজের স্বতন্ত্র আসন অর্জন করেছিলেন। তাঁর লেখা 'দুঃস্বপ্ন' গল্পটি দিয়ে বিমল কর সম্পাদিত 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'-র গল্পমালার সূচনা হয়েছিল। ফলে নতুন রীতির রূপগত কাঠামোর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের ভাষিক শিল্পের নির্মিতিতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একটি সাক্ষাৎকারে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বলেছেন — ''শিল্পীর দায়িত্ব হচ্ছে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো, অন্য কিছু নয়। প্রতিবাদ বা স্লোগান নয়। কারণ আমার মতে সেটা শিল্প সঙ্গত হবে না। সচেতন শিল্পীর কমিটমেন্ট বলতেও আমি এই বুঝি।''[৪] প্রকৃতি, মানুষ, যৌনতার ভিন্নরূপ সংবেদনশীল মননে তিনি নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করে গেছেন। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় জীবনের বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে কোথাও যেন সর্বশক্তিমান প্রকৃতির রূপ বহুমাত্রিক জীবন-জিজ্ঞাসায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্প-প্রকরণে একপ্রকার সংবেদনশীল কবিমনের অনুরণন ক্রিয়াশীল। গদ্যে রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে কাব্যময়তা থাকবে একথা অনস্বীকার্য। প্রকৃতির অবয়ব চিরটাকালই তাঁকে নাড়া দিয়েছে। কবি জীবনানন্দের কাব্যিক ভাষ্যও তাঁর মনে কম আলোড়ণ তোলে নি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বয়ানে — ''... আমার ভাষা বা ভাবনায় তিনি (জীবনানন্দ দাশ) অনেক প্রেরণা জুগিয়েছেন। ওঁর 'বেড়াল' নামে কবিতার কথা ভাবুন, কিংবা মনে করুণ 'হাওয়ার রাত' কবিতা — এক অসাধারণ কবিতা। কতবার যে ওই কবিতা আমি পড়েছি! ওর কবিতার চিত্ররূপময়তা তুলনাহীন।''[৫] তবে তাঁর গদ্যে যে কাব্যময়তার রঙ রয়েছে তা তার বাল্যকালে রবীন্দ্রকাব্য পড়ার ফল এবং শৈশবঋদ্ধ অভিজ্ঞতা। প্রতিদিন সূর্য ওঠার পূর্বে ঠাকুরদার সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণের সময় হেলিডি সাহেবের বাংলোর লাগোয়া ফুলের বাগানে শিশিরস্নাত সদ্য ফোটা গোলাপ এবং সেখানে বসে থাকা সোনালী প্রজাপতির আনাগোনা তাঁর কাব্যিক মেজাজ তৈরী করেছিল, যার প্রতিবিম্ব আমরা তাঁর ছোটগল্পের প্রতিটি কাহিনীবৃত্তে পেয়ে যাই। এই অন্তর্মুখী শিল্পীর অন্তঃসংলাপেই ধরা পড়ে তাঁর নিজস্ব জীবন-জিজ্ঞাসার স্বরলিপি — ''... নিজের রচনার ভাল-মন্দ যাচাই করতে শিল্পী যত বেশি বাইরের দিকে তাকাবেন তত বেশি তাকে ঠকতে হবে।''[৬] একজন শিল্পীর শিল্পকর্মের সঙ্গে এসে মিশেছে অকৃত্রিম নিরাসক্তির টান। 'পূর্বাশা'-য়, 'সূর্য', 'ত্রৈমাসিক পরিচয়'-এ 'নদী ও নারী' এবং 'দেশ' পত্রিকায় 'অনাবৃষ্টি' মোট তিনটি উল্লেখযোগ্য গল্প বেরিয়েছিল। তখন শ্রী সাগরময় ঘোষ 'দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। কয়েকদিন পরই হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ'-এ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প ছাপা হয়েছিল। গল্পটির নাম 'শালিক কি চড়ুই'। 'পূর্বাশা', 'দেশ', 'চতুরঙ্গ', 'মাতৃভূমি', 'ভারতবর্ষ', 'পরিচয়' ইত্যাদি কাগজে একের পর এক 'মঙ্গলগ্রহ', 'পালিশ', 'বধিরা', 'কমরেড', 'শালিখ কি চড়ুই', 'শশাঙ্ক মল্লিকের নতুন বাড়ি', 'বনানীর প্রেম', 'নদী ও নারী' গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। তখনও তিনি উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন নি। মূলত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আত্মকথনে জানতে পারি — ''ছোটগল্প এক জিনিস, উপন্যাস আলাদা শিল্প। উপন্যাস লিখতে হলে ছোটগল্প লিখে হাত পাকাবার দরকার পড়ে না। বরং বেশি ছোটগল্প লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে উপন্যাসের মধ্যে ছোট গল্পের মেজাজ এসে যাবার ভয় থাকে। ...'' [৭] আসলে শিল্পীর জীবনকে তিনি দ্বৈত মেরুর মনোভাবে পর্যবেক্ষণ করে গল্পের আকারে বাস্তব রূপ দিয়েছেন।

শুধু গল্প কেন বাংলা কথা সাহিত্যের জগতেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আজীবন লেখালেখি করেছেন বাংলা ভাষায় প্রবাহিত বহুমুখী বানিজ্য এবং অবানিজ্যিক অসংখ্য পত্র-পত্রিকায়। মানুষ ও প্রকৃতির

বিচিত্র পটভূমি, বিস্তৃত প্রেক্ষাপট থেকে তিনি আহরণ করেছেন তাঁর নিজের গল্পের উপকরণ। ‘দেশ’, ‘অমৃত’, ‘আনন্দবাজার’, ‘যুগান্তর’, ‘উল্টোরথ’, ‘জলসা’, ‘সিনেমা জগৎ’-এর মতো অজস্র বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সমান্তরালভাবে লিখেছেন ‘পূর্বাশা’, ‘পরিচয়’, ‘চতুরঙ্গ’, ‘অনুক্ত’, ‘সোনার বাংলা’, ‘নবশক্তি’, ‘বাংলার বাণী’ ইত্যাদি অবাণিজ্যিক ছোট কাগজে। গল্প, উপন্যাস নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার ঝোঁক ছোটগল্পকার হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখনী সত্তার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। উপরিউক্ত বিষয়গুলি নিরীক্ষণ করে ছোটগল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পগুলিকে জীবন-জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করে পর্যালোচনা করার পরিকল্পনা করেছি।

উৎস সূত্র :

১। বাংলা ছোটগল্প, শিশিরকুমার দাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০ পৃ: ৩৬।

২। সাহিত্যে ছোটগল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা: লি:, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪৫০, পৃ: ১৯৭।

৩। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প, সম্পাদনা সুব্রত রাহা ও অজয় দাশগুপ্ত, বিবেক ভারতী, ১২ সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ:

৪। ‘মুখাবয়ব’ পত্রিকা, গদ্যের মুখ এবং মুখোশ (১৯৯৬-২০১৩), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : জন্মশতবর্ষোত্তর বিশেষ সংখ্যা ১৪২০, সম্পাদক দেবব্রত দেব, পৃ: ১৫৬।

৫। তদেব — পৃ: ২৯৭।

৬। তদেব — পৃ: ৩৩৭।

৭। তদেব — পৃ: ৩৩৫।

————